হ্যান্ডআউট অধিবেশন–১.৯

উন্নয়ন সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত

(যে সকল মতামতের সাথে আপনি একমত সে গুলোর উপর √চিহ্ন দিন)

১. বর্ধিত উৎপাদনের মাধ্যমে জনগণের মাথাপিছু আয় বাড়ানোই উন্নয়ন প্রচেষ্টার লক্ষ্য হওয়া উচিৎ।

২. ধনীক শ্রেণীর সাহায্য ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়।

৩. সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করাই উন্নয়নের লক্ষ্য।

৪. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থলগ্নিকারী সংস্থাসমূহকে ঋণ ফেরত পেতে হলে বিত্তহীন জেলেদেরকে ঋণ প্রদান করা উচিৎ নয়।

৫. সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জেলেদেরকে সংগঠিত করে আত্মনির্ভরশীলতার ভিত্তিতে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

৬. অর্থনৈতিক সাহায্য ও সহায়তা ছাড়া জেলেদের উন্নয়ন কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

৭. উন্নয়ন হচ্ছে সেই প্রচেষ্টা যা আত্মনির্ভরশীলতার ভিত্তিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জনগণকে সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় সংগঠিত হতে সাহায্য করে।

৮. জেলেদের কিভাবে উন্নয়ন করতে হবে তা সরকারী কর্মকর্তাগণই নির্ধারণ করবেন।

৯. সফল সম্প্রসারণকর্মী হতে হলে বলার চেয়ে বেশী শোনা, শেখানোর চেয়ে বেশী শেখা এবং নেতৃত্ব দেয়ার চেয়ে বেশী সহযোগিতা করার মনোভাব থাকতে হবে।

১০. উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের জন্য সমষ্টিগত প্রচেষ্টার চেয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে প্রাধান্য দিতে হবে।

১১. বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দরিদ্র জেলেদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ব্যতিরেকে মৎস্য উৎপাদন তথা এ ক্ষেত্র থেকে আয় বাড়ানো সম্ভব নয়।

১২. সম্প্রসারণ কর্মকর্তার অভীষ্ট দলের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের ভ্রান্ত ধারণা পরিবর্তন করে সৃজনশীল কাজের জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

শহীদ হোসেন তালুকদার
উপদেষ্টা (প্রশিক্ষণ)
কানাডীয়ান রিসোর্স টীম

হ্যান্ডআউট ঃ অধিবেশন–১.৯

সচেতনতা বৃদ্ধি ও সামাজিক বিশ্লেষণ কৌশল *

উন্নয়ন একটি আপেক্ষিক বিষয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, সকল উন্নয়ন কার্যক্রম সমাজের সকল লোকের সমস্যার সমাধান দিতে পারে না–বরং দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উন্নয়নের অধিকাংশ সুফল ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই ভোগ করে। এর কারণ খুব সাধারণ ও পরিষ্কার। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কতকগুলি মৌলিক ধাপ রয়েছে, যেমন– চাহিদাসমূহ চিহ্নিতকরণ, বাস্তবায়ন ও সবশেষে মূল্যায়ন। বার বার দেখা গেছে যে, উন্নয়নের এই সমগ্র চক্রটির উপর দরিদ্র ও ক্ষমতাহীন মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলস্বরূপ উন্নয়নের সুফল প্রকৃত অভাবগ্রস্ত জনগণের কাছে পৌঁছে না।

প্রত্যেক মানুষেরই আশা–আকাঙ্খা, যোগ্যতা–সামর্থ্য ও সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে। এসবের বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত অনুকূল পরিবেশ, প্রয়োজন এসবকে পরিস্ফুটিত করা ও যথাযথ পরিচর্যা করা। কিন্তু বাস্তবে এর বিপরীত চিত্র দেখা যায়। এমন হওয়ার কারণ মালিকানা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত, সামাজিক ব্যবস্থা স্থবির, সংখ্যাগরিষ্ঠ–মানুষের উপর শহুরে সংস্কৃতির প্রাধান্য এবং সবশেষে, বুর্জোয়া এলিট গোষ্ঠীর মতাদর্শ দিয়ে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মতাদর্শকে আচ্ছন্ন করে রাখা। এটি চক্রাকার ও ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়া।

প্রতিটি মানুষেরই প্রত্যাশা আর্থিক ও সামাজিকভাবে মুক্ত জীবন। এই মুক্তি প্রক্রিয়ায় প্রয়োজন ব্যক্তি ও দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টার জন্য জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও পারস্পরিক মত বিনিময় অত্যাবশ্যক। এজন্যে অবিরত সংগ্রাম ছাড়া আর কোন সহজ ও সংক্ষিপ্ত উপায় নেই। এই উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় এবং অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করার জন্য বর্তমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণ, প্রতিফলন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করতে হয়। শুধু এভাবেই একজন দরিদ্র লোক জগতকে ও তার পারিপার্শ্বিক বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

পাওলো ফ্রেইরী এই প্রক্রিয়াকে আত্মোপলব্ধির প্রক্রিয়া (Conscientization process) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আত্মোপলব্ধির এই প্রক্রিয়াটি হচ্ছে আলোচনার মাধ্যমে মত বিনিময়ের প্রক্রিয়া (dialogical process)। ফ্রেইরী আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। কেন না, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মানুষকে সৃষ্টিশীল না করে সংকীর্ণ করে তোলে। তিনি এধরনের শিক্ষাকে একটি ব্যাংকিং পদ্ধতির সাথে তুলনা করে বলেছেন যে, এই শিক্ষায় শিক্ষক তার জ্ঞানকে শিক্ষার্থীর মাথায় জমা করে রাখেন যাতে ভবিষ্যতে প্রয়োজনের সময় শিক্ষার্থী তা ব্যবহার করতে পারেন। ফ্রেইরী আরও বলেন যে, আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে উদ্দেশ্য ও শিক্ষককে বিধেয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফ্রেইরী এধরনের শিক্ষার সমালোচনা করে বলেন যে, এই শিক্ষা মানুষের সৃষ্টিশীলতা ও আভ্যন্তরীন প্রবৃদ্ধিকে ধ্বংস করে দেয়। আত্মোপলব্ধির জন্য একজন ব্যক্তির প্রয়োজন আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া।

ফ্রেইরী তিন ধরনের সচেতনতার কথা উল্লেখ করেছেন। যথা, ঐন্দ্রজালিক ও গুপ্তশক্তিপূর্ণ (magical) সরল (naive) ও সমালোচনামূলক (critical) সচেতনতা। ঐন্দ্রজালিক সচেতনতা অধিবিদ্যামূলক (metaphysical) চিন্তার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। এক্ষেত্রে সকল প্রচেষ্টার অথবা প্রভাবের কারণসমূহকে মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে অনুসন্ধান করা হয়। মানুষ ভাগ্যবাদ দ্বারা তাড়িত। সে ভাগ্যের উপর নির্ভর করে এবং খারাপ কিছু হলে সে ভাগ্যকে দোষারোপ করে।

সরল সচেতনতা হচ্ছে মনের এমন একটি অবস্থা যা ঐন্দ্রজালিক ও সমালোচনামূলক সচেতনতার মাঝামাঝি অবস্থাকে নির্দেশ করে। এই অবস্থায় মন একটি পরস্পর বিরোধী দ্বন্দ্বে ভোগে। পক্ষান্তরে, সমালোচনামূলক সচেতনতা হচ্ছে মনের এমন একটি অবস্থা যখন মন কোন প্রভাব বা প্রতিক্রিয়ায় যুক্তিসঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করে। এক্ষেত্রে একটি সমাজের অবস্থার প্রকৃত কারণ সামাজিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিরূপণ করা হয়। এক্ষেত্রে কোন কিছুকেই অলঙ্ঘনীয় সত্য হিসেবে ধরে নেয়া হয় না। সকল ধরনের বিষয়েই সংখ্যাতাত্ত্বিক ও গুণগত ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করা হয়। সমালোচনামূলক সচেতনতার ধারাবাহিক প্রক্রিয়াটি নীচের চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়।

অভিজ্ঞতা ——→ সামাজিক বিশ্লেষণ ——→ প্রতিফলন ——→ পদক্ষেপ গ্রহণ

---

* পলচারওরা টিগা, পরিচালক, কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনষ্টিটিউট, ঢাকা ১৯৮৬।

এই পর্যায়ে সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, উন্নয়ন হচ্ছে মানুষের, এবং তা মানুষের জন্য মানুষের দ্বারাই হয়ে থাকে। আত্মোপোলব্ধি বা সচেতনতা হচ্ছে উন্নয়নের দিক নির্দেশক যা উন্নয়নকে এর লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য সঠিক পথে পরিচালিত করে।

সামাজিক বিশ্লেষণ

সামাজিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন কেন? সামাজিক বিশ্লেষণ হচ্ছে সামাজিক বাস্তবতাকে জানার একটি উপায়। সামাজিক বিশ্লেষণ উন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সুপ্ত ও জাগ্রত বাধাসমূহকে চিহ্নিত করার ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করে থাকে।

সামাজিক বিশ্লেষণ সমগ্র বিষয়টিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে এই সব অংশসমূহ কিভাবে পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা জানতে সাহায্য করে। উন্নয়নের লক্ষ্য ও বাস্তবতার মধ্যে কেন ব্যবধান রয়েছে তা জানতেও সামাজিক বিশ্লেষণ আমাদের সহায়তা করে। এটা আমাদের দেখিয়ে দেয় কোন্ কোন্ সমস্যার কারণে প্রকৃত উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। শুধু বাস্তবতাকে জানাই সামাজিক বিশ্লেষণের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। সমাজ বিশ্লষণকারীকে বাস্তবতাকে আবিষ্কার করার পর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। একজন সমাজ বিশ্লেষককে ডাক্তারের সাথে তুলনা করা যায়। একজন ডাক্তার প্রথমে রোগীর অসুস্থতার কারণ নিরূপণ করেন এবং তারপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন।

অনুরূপভাবে, একজন সমাজ বিশ্লেষক প্রথমে সমাজের সমস্যাসমূহের কারণ নির্ণয় করেন এবং দেখেন কারা সবচেয়ে বেশী বঞ্চিত ও শোষিত। তারপর তিনি দেখেন শোষণের এই প্রক্রিয়া কিভাবে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এই বিশ্লেষণের পরই এসবের প্রতিকারের জন্য সঠিক ব্যবস্থা সুপারিশ করা তার পক্ষে সম্ভব।

বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করার জন্য একটি গল্পের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। একদল অন্ধলোক একটি হাতী দেখেছিলো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হাতীর পা ধরে বললো যে এটি একটি পিলারের মত। এভাবে কেউ কান ধরে, কেউ মাথা ধরে, কেউ শুড় ধরে এটাকে বিভিন্ন জিনিসের মত মনে করলো। অথচ আমাদের চোখ আছে বলেই আমরা সঠিকভাবে জানি যে একটি হাতী প্রকৃত পক্ষে কেমন। সামাজিক বিশ্লেষণ ছাড়া সমাজকে আমরা ঐ অন্ধ লোকদের মতই দেখে থাকি। তাদের মতই আমরা সামাজিক বাস্তবভাকে ক্ষুদ্র দৃষ্টিকোন থেকে আংশিকভাবে দেখে থাকি। ফলে আমরা প্রকৃত বাস্তবতাকে না দেখে শুধু বাস্তবতার ছায়াটিকে দেখতে পাই। ফলস্বরূপ আমরা সমস্যার মূল কারণসমূহকে দূর করতে ব্যর্থ হই। যখন ইন্‌জেকশন বা অপারেশন দরকার তখন মলমের প্রলেপ দেওয়ার মতই আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সুতরাং একথা বলা যায় যে, সামাজিক বিশ্লেষণ সমস্যার মাত্রা ও দিক নিরূপণ করার জন্য আমাদেরকে বিশ্লেষণমূখী জ্ঞান প্রদান করে, আমাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও সমগ্র সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা জাগিয়ে তোলে।

সামাজিক বিশ্লেষণ কোন ইস্যুর মূল কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে, অথবা কোন সমাজকাঠামোর সামাজিক বিশ্লেষণ হতে পারে। সামাজিক বিশ্লেষণটি যখন কোন সমাজ কাঠামোকে নির্দেশ করে, তখন নিম্নোক্ত বিষয়সমূহকে বিশ্লেষণ করতে হয়ঃ ১) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ২) সামাজিক ব্যবস্থা, ৩) রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ৪) সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা ও ৫) আদর্শ। নীচের চিত্রে বিষয়টিকে দেখানো হলোঃ

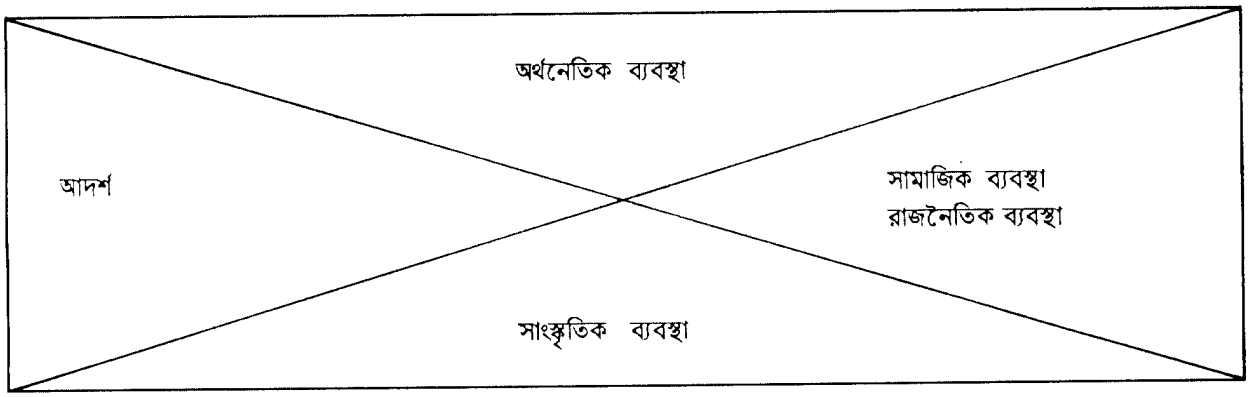

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

এক্ষেত্রে আয়ের সকল উৎসকে বিশ্লেষণ করে দেখা হয়। উদাহরণস্বরূপ, প্রাথমিক পর্যায়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, কে উৎপাদনের উপায়সমূহের (জমি, জল-সম্পদ, ইত্যাদি) মালিক। মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, কারা শিল্পসমূহের মালিক ও সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

অতঃপর তৃতীয় পর্যায়ে প্রশ্ন করা যায় যে, কারা যানবাহন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিক ও সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এধরনের বিস্তারিত বিশ্লেষণ থেকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিগুঢ় ও মূল সমস্যা এবং জটিলতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা ও জ্ঞান গভীর ও বিস্তৃত হয়। এগুলিকে যদি সঠিকভাবে বুঝতে পারা না যায় তাহলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন আনা প্রায় সম্ভব নয়।

সমাজ বিজ্ঞানের গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিসমূহের সাহায্যে একটি সমাজ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা একজন ব্যক্তির মনের অত্যন্ত গভীরে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে, মানুষ সংস্কৃতিকে ভুলভাবে অনুধাবন করে। অধিকাংশ লোকই সংস্কৃতির বাহ্যিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সংস্কৃতির আভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহের (জ্ঞান, মনোভাব, এবং বিশ্বাসের) উপর খুব কমই গুরুত্ব দেয়া হয়। ই, বি, টেলর সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, এটি জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নৈতিকতা, আইন, সামাজিক প্রথা এবং মানুষ সমাজের একজন সদস্য হিসেবে অন্য যে সকল ক্ষমতা ও অভ্যাস অর্জন করে সে সবের একটি জটিল অখন্ড সত্ত্বা। এই সংজ্ঞাটিতে সংস্কৃতির আভ্যন্তরীণ বিষয়ের উপরই জোর দেয়া হচ্ছে। সবশেষে বলা যায় যে, সংস্কৃতির মূল প্রোথিত থাকে মানুষের মূল্যবোধের মধ্যে। মূল্যবোধ পদ্ধতি (Value System) হচ্ছে ব্যক্তির মূল্যায়নের প্রক্রিয়া। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি অন্য যে কোন জিনিস অপেক্ষা কোন একটি বিশেষ জিনিসকে বেশী মূল্য দিতে পারে। এই দিকটি একজন সমাজ বিশ্লেষক ও পদক্ষেপ গ্রহণকারীকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

আমরা বিশ্লেষণ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে নীচের চিত্রের সাহায্যে সহজ ও সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করতে পারি।

উন্নয়ন একটি দূর্ঘটনা নয়। এটা চাপিয়ে দেয়া কোন বিষয়ও নয়। উন্নয়ন হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অবস্থা ও পরিস্থিতির সম্মিলিত ফল। এসব অবস্থাসমূহ যুক্তি ও বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সুতরাং অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য, প্রত্যাশিত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন উপরোক্ত পদ্ধতিতে সমগ্র উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করা। আর তা করা হলেই উন্নয়ন অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য প্রত্যাশিত সুফল বয়ে আনবে।

প্রেষণার নীতিমালা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ

প্রেষণা বলতে বোঝায় একজন ব্যক্তিকে তার উদ্দিষ্ট কর্মের দিকে পরিচালিত করার জন্য তার ভেতরে ইচ্ছা বা প্রবণতা সৃষ্টি করা।

প্রেষণার নীতিমালা

কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রসঙ্গে ডগলাস ম্যাক্‌গ্রেগর দুটি মৌলিক ধারণা পোষণ করেন। তার প্রথম ধারণাটি X তত্ত্ব (X Theory) নামে পরিচিত। এ তত্ত্বটি Stick and Carrot ধারণার সাথে বহুলাংশে সাদৃশ্যপূর্ণ। সংক্ষিপ্তাকারে তত্ত্বটির মূল ধারণা নীচে বর্ণনা করা হলঃ

১. সাধারণ একজন মানুষ সহজাতভাবে কর্মবিমুখ এবং যদি পারে, সে কাজ এড়িয়ে চলবে।
২. যেহেতু মানুষের রয়েছে স্বভাবজাত কর্মবিমুখতা, সেহেতু তাদের অনেককেই বলপূর্বক বাধ্য, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করতে হবে, এবং শাস্তির ভয় প্রদর্শন করতে হবে, যার ফলে তারা সংগঠনের উদ্দেশ্যগুলো চরিতার্থ করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সচেষ্ট হয়।
৩. একজন সাধারণ মানুষ কারো দ্বারা পরিচালিত হতে পছন্দ করে, দায়িত্ব এড়িয়ে চলতে চায়, তুলনামূলক ভাবে তার উচ্চাকাঙ্খা কম এবং সর্বোপরি সে নিশ্চয়তা চায়।

ম্যাকগ্রেগরের দ্বিতীয় ধারণাটিতে (তত্ত্ব) বৈপরীত্য লক্ষ্যণীয়। এ ধারণাটিকে Y তত্ত্ব (Y Theory) বলা হয়। নীচে তার বর্ণনা দেয়া হলঃ

১. কাজে যে শারীরিক এবং মানসিক শ্রম খরচ করা হয়, তা খেলাধুলা করা বা বিশ্রাম নেয়ার মতই স্বাভাবিক।
২. সাংগঠনিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বহির্নিয়ন্ত্রণ ও শাস্তির ভয় প্রদর্শন একমাত্র উপায় নয়। মানুষ তার উদ্দেশ্যের প্রতি অঙ্গীকার রক্ষার্থে আত্ম-পরিচালনা এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অনুশীলন করবে।
৩. উদ্দেশ্যের প্রতি কারো অঙ্গীকারবোধ বা বিশ্বস্ততা নির্ভর করে তার কর্মফলের জন্য প্রাপ্ত পুরস্কারের উপর।
৪. যথাযথ পরিবেশে, একজন সাধারণ মানুষ কেবলমাত্র দায়িত্ব গ্রহণ করতেই শেখে না, বরং সে দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসতে চায়।
৫। সাংগঠনিক সমস্যা সমাধান করার জন্য তুলনামূলকভাবে যে উচ্চ পর্যায়ের কল্পনাশক্তি, কৌশল ও উদ্ভাবন ক্ষমতা বা সৃজনশীলতার প্রয়োজন হয়, সেগুলো, সীমিতভাবে নয়, বরং বহুলাংশে সাধারণ মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়।
৬. আধুনিক শিল্পভিত্তিক জীবন-ব্যবস্থায় একজন সাধারণ মানুষের চিন্তাশক্তির সম্ভাবনাকে আংশিকভাবে কাজে লাগানো হয়।

যদি জিজ্ঞেস করা হয়, কোন তত্ত্বটি সবচেয়ে ফলপ্রসূ হবে যখন তা একজন তত্ত্বাবধায়কের দৃষ্টিভঙ্গি বা কর্ম পদ্ধতিতে প্রকাশ পায়, তখন তার উত্তর নিঃসন্দেহে হবেঃ "Y" তত্ত্বটি।

প্রেষণার প্রতিবন্ধকতাসমূহ ঃ

যে সকল কারণে কার্যকরী প্রোষণার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, সেগুলো নীচে বর্ণনা করা হলঃ

১. সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের সুযোগের অভাব;
২. ভালো কাজের জন্য উৎসাহপ্রদ পুরস্কারের ব্যবস্থা না করা;
৩. সংগঠনের ভিতরে বিশ্বাস এবং আন্তরিকতার অভাব;
৪. নেতৃত্বে বিশ্বাসের অভাব;
৫. দলীয় ঐক্যানুভূতি ও সমবেত কাজের অভাব;
৬. কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্যের অভাব;
৭. চাকূরী হারানোর ভয়, বিশেষ করে যখন কাউকে চাকূরীতে সাময়িকভাবে নিয়োগ করা হয়;
৮. কাজের প্রকৃতি একঘেয়ে হয়;
৯. দুর্বল পরিকল্পনা ও অপর্যাপ্ত সহোযোগিতা;
১০. উদ্দেশ্যাবলী ও কাজসমূহের ধারণা সম্পর্কে অস্বচ্ছতা;
১১. সংগঠন বা দলের ভেতরে রীতিসম্মত যোগাযোগ প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতি, এবং
১২. কোন কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় নৈপুণ্যের অভাব।

প্রেষণাদাতা হিসাবে আপনি কতখানি সফল?

১. উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণে আপনি কি আপনার সহকর্মীদের/গৃহীত কর্মসূচীর সুফল ভোগকারীদের জড়িত করেন?
২. কর্মসূচী পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, এবং মূল্যায়ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আপনি কি তাদের জড়িত করেন?
৩. আপনি কি তাদের পরামর্শ ধৈর্য্য সহকারে শ্রবণ করেন?
৪. তাদের সমস্যাবলী আপনাকে জানাতে চাইলে, আপনি কি তা শোনেন?
৫. সমস্যা বিশ্লেষণ, তার কারণ নির্ধারণ ও সমাধানের পথ সন্ধানে আপনি কি তাদের সাহায্য করেন?
৬. কর্মসূচী বাস্তবায়নে তারা যে যে অসুবিধার সম্মুখীন হয় তা দূরীকরণার্থে আপনি কি আপনার সাধ্যমত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন?
৭. আপনি কি সহকর্মী এবং গৃহীত কর্মসূচীতে যারা লাভবান হয় তাদের ক্রিয়াকলাপের আন্তরিক স্বীকৃতি দেন?
৮. আপনি কি জ্ঞাতসারে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেন?
৯. যখন আপনি তাদের দিয়ে অতিরিক্ত সময় ও কষ্টসাধ্য কাজ করান তখন কি এর কারণ ব্যাখ্যা করেন?
১০. কাজ করে যাতে তারা আনন্দ ও গর্ববোধ করে এমন পরিবেশ সৃষ্টি ও রক্ষণে আপনি কি সহায়তা করেন?
১১. আপনি কি আপনার সহকর্মী/দলের সদস্যদের কাছ থেকে উচ্চমানের কার্যক্ষমতা আশা করেন?
১২. আপনি কি যৌথভাবে কাজ করার লক্ষ্যে সবাইকে একটি দল হিসেবে গড়ে তুলতে আগ্রহী ও প্রয়াসী?
১৩. আপনি কি তাদের উদ্যোগ, দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি করে দেন?
১৪. তাদের কাছ থেকে আগত কোন পরামর্শ যদি গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে আপনি কি তাদের কাছে পরামর্শটি গৃহীত না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেন?
১৫. তাদের কাজ দক্ষতার সাথে সম্পাদন করার জন্য আপনি কি প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন?
১৬. আপনি কি নিম্নলিখিত বিষয়ে সুন্দর দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন?
   - সময়ানুবর্তিতা
   - কাজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি
   - বি, আর, ডি, বি'র প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি
   - পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও গোছগাছ
   - নিরাপত্তা
১৭. যাদের প্রেষণা দেবেন তাদের সম্পর্কে অর্থাৎ তাদের অতীত, শখ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে ওয়াকিবহাল?
১৮. আপনি কি দৃষ্টান্তমূলক উদ্দীপনা প্রদর্শন করেন?
১৯. কর্মসূচীতে যারা উপকৃত হবে আপনি কি তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করেন?
২০. প্রয়োজনের সময় আপনি কি সহকর্মীদের/সদস্যদের সাহায্য করেন?
২১. প্রত্যেকের মেধার পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে সঠিক ব্যক্তিকে কাজ বন্টণের যে প্রক্রিয়া তাতে কি আপনি সহায়তা দান করেন?
২২. আপনি কি প্রত্যেকের জন্য বিশেষ কাজ ও দায়িত্ব নিদিষ্ট করে দেন?
২.৩ আপনি কি কাজের প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন?
২৪. আপনি কি কাজকে সতর্কতার সাথে এমনভাবে বিন্যাস করেন যাতে সবার হাতেই কাজ থাকে এবং কাউকে অযথা পরিশ্রম করতে না হয়?
২৫. আপনি কি দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চান?
২৬. আপনি কি সংগঠন ও দল ছেড়ে সহকর্মী এবং সদস্যদের চলে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করেন?
২৭. ব্যবস্থাপনার ও কর্মসূচী উন্নয়নের লক্ষ্যে আপনি কি আপনার সহকর্মী ও দলীয় সদস্যদের কাছ থেকে নিয়মিত মতামত পান?
২৮. তাদের কর্ম-পদ্ধতি ও কর্মক্ষমতার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আপনি কি তাদের কাজের মূল্যায়ন করে সে সম্পর্কে মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেন?

কি আমাকে উদ্বুদ্ধ করে

নিম্ন লিখিত তালিকা থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৫টি বিষয় বেছে নিন যেগুলি আপনাকে কাজে উদ্বুদ্ধ করে বলে আপনি বিশ্বাস করেন অথবা উক্ত কাজ করার উৎসাহের পিছনে আপনাকে বেশি প্রভাবিত করে।

১. আমি উপভোগ করি এই জন্য যে কাজটি আনন্দদায়ক
২. অন্যরা করে তাই
৩. এই কাজে অন্যের স্বীকৃতি পাওয়া যায়
৪. কাজটি সহজ
৫. আমি অনুভব করি যে কাজটি গুরুত্বপূর্ণ
৬. যখন কাজ করি তখন নিজেকে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত মনে হয়
৭. একটি ভাল কাজ করার সুযোগ পেয়েছি
৮. আমি যদি কাজ না করি তাহলে শাস্তি পাব
৯. আমার পরিকল্পনায় সহায়তা করার সুযোগ ঘটেছে
১০. সকলের সাথে কাজ করতে ভাল লাগে
১১. দায়িত্ব পালনের বা গ্রহণের সুযোগ হয়েছে
১২. আমি কাজ করতে বেশি স্বাধীনতা পাই
১৩. আমি নিজেকে আরও বিকশিত করার সুযোগ পাব
১৪. অন্যের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয়
১৫. আমি এই কাজ করলে পুরস্কার পাব (অর্থ, প্রশংসা, তৃপ্তি)

হ্যান্ডআউট—অধিবেশন ১.১০

উন্নয়নের পন্থা/কৌশল *

উন্নয়নকে এমন একটি প্রক্রিয়া হিসাবে ধরা যায় যার মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট সময়ে সমাজে কোন পরিবর্তন আনা হয়। এখানে আমরা উন্নয়নের দুটো উপায় বা পথ সম্পর্কে আলোচনা করবো। এদের মধ্যে একটি সেবামূখী (Service Oriented) এবং অপরটি গণমূখী (People Oriented)।

সেবামূখী পন্থা (Service-oriented Approach)

এই পন্থায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সেবা (Service) দিয়ে জনজীবনের বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হয়। যেমনঃ পাওয়ার টিলার, রাসায়নিক সার ইত্যাদি ব্যবহার করে কৃষিক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হয়। এই পরিবর্তনের ফলে ফলন বাড়ার সম্ভাবনা থাকে আর ফলন বাড়ার সাথে সাথে যারা এসব ব্যবহারের সুযোগ পান তাদেরও আয় বেড়ে যায়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে এই পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজের সবাই সমানভাবে উপকৃত হচ্ছে। এটা শুধু তাদেরই উপকারে আসে যাদের এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করার মত ক্ষমতা ও সামর্থ রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই প্রক্রিয়ার ফলাফল ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়ে দেয়। সমাজে ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য আরও জোরদার হয়। উপরন্তু এই পরিবর্তন সামাজিক আচরণ এবং মূল কাঠামোর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হলো উন্নয়নে সেবামূখী পন্থাকে বেছে নিলে প্রকৃত পক্ষে কারা উপকৃত হচ্ছে? আমাদের অবশ্যই চিন্তা করতে হবে শতকরা কতজন লোক উৎপাদনের উপকরণসমূহের মালিক এবং তা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
ক্ষমতার কাঠামো এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, সম্পদ কেন্দ্রীভূত হলে ক্ষমতাও কেন্দ্রীভূত হয়। আবার, ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলে এর যথেষ্ট ব্যবহার এবং প্রভুত্ব করার প্রবণতা দেখা যায়। ফলে শোষক ও শোষিতের মধ্যে সামাজিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

সেবামূখী এই পন্থাকে অন্য কথায় মানবমূখীও বলা যায়। এই পন্থা উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানকে (Service Giving) নিশ্চিত করে কিন্তু কখনও দেখে না কে কি পেল এবং কিভাবে তা পেল। এই প্রক্রিয়ার গুরুত্ব এখানেই যে এটা যে-সব প্রয়োজন নির্ণয় করে সে-সব প্রয়োজন অনুযায়ী এটা কাজ করে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া কখনই সামাজিক বৈষম্য এবং অসামঞ্জস্যের মূল কারণগুলো চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে না।

গণমূখী পন্থা (People Oriented Approach)

সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া বলতে আমরা সেই প্রক্রিয়াকে বুঝি যা বৈষম্যমূলক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো, সামাজিক সম্পর্ক, মূল্যবোধ, আচরণ ও পরিবেশের পরিবর্তন আনয়ন করে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ কাঠামো স্থাপনে সহায়তা করে।

এটা শুধু তখনই সম্ভব যখন আমরা এমন একটি পথ অবলম্বন করব যার সাহায্যে সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠী নিজেদের সমস্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূল কারণ চিহ্নিত করে তার সমাধানকল্পে নিজেরাই সক্রিয় ভূমিকা নেন-এই পন্থা মানব কেন্দ্রিক নয়। কেননা এটা মানুষকে তার প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করে। এই প্রক্রিয়াকে বলা যায় গণমুখী বা মানবীয়। এই গণমুখী পন্থা মানুষকে অসম সামাজিক ব্যবস্থা, শোষণ এবং ভ্রান্ত সামাজিক মুল্যবোধ, যা তাদের নিত্য দিনের জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করে সে সম্পর্কে সচেতন হতে সাহায্য করে এবং জনগণ যাতে নিজেরাই এসব অসামঞ্জস্য দূর করতে পারেন সে জন্য সাহায্য করে।

এখন কথা হলো আমরা কোন পথ ধরব? আমরা কি সেই পথ বেছে নেব যা ধনী, দরিদ্রের ব্যবধান বাড়িয়ে দেয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠকে উপেক্ষা করে সীমিত সংখ্যক লোকের সেবায় নিয়োজিত হয়? না সেই পথ, যা উপেক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সুসংগঠিতভাবে তাদের নিজেদের সমস্যার মূল কারণ খুঁজে বের করতে ও তা সমাধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং কর্মকান্ড বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করে?

---

* শহীদ হোসেন তালুকদার, উপদেষ্টা (প্রশিক্ষণ), ক্যানাডিয়ান রিসোর্স টীম, ঢাকা, ১৯৯০।

গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর সার সংক্ষেপ *

বাংলাদেশে প্রায় ৮৬০০০ গ্রাম রয়েছে। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯০ শতাংশ লোক গ্রামে বাস করে। উৎপাদনশীল সম্পদের মালিকানা, ক্ষমতা ও কৌলিন্যের ভিত্তিতে এ দেশের গ্রামীণ সমাজ মারাত্মকভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত।

গ্রাম বাংলার অন্যতম প্রধান উৎপাদনশীল সম্পদ হচ্ছে ভূমি। যাদের জমি আছে সমাজে তাদের ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও কৌলিনাও রয়েছে। তারা শুধু গ্রাম এলাকার খাদ্যের উৎপান ও বন্টণকেই নিয়ন্ত্রণ করে না, সরকার কর্তৃক যোগানকৃত উৎপাদনশীল সম্পদের ক্ষেত্রেও তাদের রয়েছে একচ্ছত্র অধিকার ও প্রাধান্য। উৎপাদনশীল সম্পদের মালিকানা তাদের হাতে রয়েছে বলেই তারা গ্রামের নেতা বা মাত্বর হিসেবে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরে। তারা গ্রামের বিভিন্ন কোন্দল ও ঝগড়ার মীমাংসা করে এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক বিষয়ে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করে। কার্যকর অর্থে, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেকই ভূমিহীন। তাদের একবারেই কোন জমি নেই, অথবা থাকলেও তা বসতবাড়ীসহ আধা একরের বেশী নয়। গ্রামীণ পরিবারের আয়-স্তরের উপরের দিকের ৬ থেকে ৭ শতাংশের মালিকানায় মোট চাষযোগ্য জমির শতকরা ৪৫ ভাগ রয়েছে। অন্যদিকে, যারা কার্যকর অর্থে ভূমিহীন তাদের মালিকানায় রয়েছে মোট চাষযোগ্য জমির মাত্র তিন শতাংশ।

বৃহৎ জমির মালিক বা ভু-স্বামীদের এই শ্রেণীটি ছাড়াও যারা ইউনিয়ন কাউন্সিল, উপজেলা পরিষদ বা পার্লামেন্টের সদস্য অথবা কোন রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত তারাও গ্রামীণ সমাজে যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তির অধিকারী। এই শ্রেনীর লোকেরা তাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অর্জন করে সরকারী প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা যেমন, পুলিশের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে, অধিকাংশই আবার বৃহৎ জমির মালিক বা ভূ-স্বামী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের উপর পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায় যে, হয় তারা ধনী পরিবারসমূহ থেকে আগত নতুবা, তারা তাদের চেয়ে বেশী জমির মালিক কোন পরিবারে বিয়ে করেছে। ৫১ জন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের উপর করা এক জরীপ থেকে দেখা যায় যে, তাদের মালিকানাধীন জমির গড় পরিমাণ ১৫ একর এবং তাদের প্রায় ১ শতাংশের প্রত্যেকে ৩৩ একরের চেয়েও বেশী জমির মালিক। তাদের গড় মাসিক আয় জাতীয় গড় মাসিক আয়ের প্রায় ২৫ গুণ বেশী। এবং চেয়ারম্যানদের অধিকাংশই আবার গ্রাম্য সালিশের মাতবর বা বিচারক।

বিগত কয়েক বছরে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ও গ্রামীণ ক্ষমতা-কাঠামোতে প্রবেশ করেছে। তারা গ্রামের হাট-বাজার নিয়ন্ত্রণ করে ও অত্যন্ত উচ্চ হারে অভাবগ্রস্ত দরিদ্র লোকদের ঋণ প্রদান করে। তারা এই ঋণ অনাদায়ের সুযোগে ঋণগ্রস্ত দরিদ্র লোকদের জমিও কিনেনেয়।

উপসংহারে বলা যায় যে, বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ বিভিন্ন স্তর-বিশিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত এবং বিভিন্ন শ্রেণী বিভিন্ন মাত্রায় ও পরিমাণে ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, কৌলিন্য ও উৎপাদনশীল সম্পদের অধিকারী। জমির মালিকানার প্রেক্ষিতে গ্রাম বাংলায় চারটি সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণী রয়েছে। এই শ্রেনী চারটি হচ্ছে, বৃহৎ ভূ-স্বামী, মাঝারী ভূ-স্বামী, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং ভূমিহীণ শ্রমজীবি শ্রেণী। এ ছাড়াও আরেক শ্রেণীর লোক আছে যারা সরকারী প্রশাসনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখে অথবা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য, যেমন পার্লামেন্ট সদস্য, ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বা মেম্বার। এই শ্রেণীর লোকেরাও গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় যথেষ্ট ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রদর্শন করে থাকে।

সম্পদ ক্ষমতার প্যারামিড চার্ট

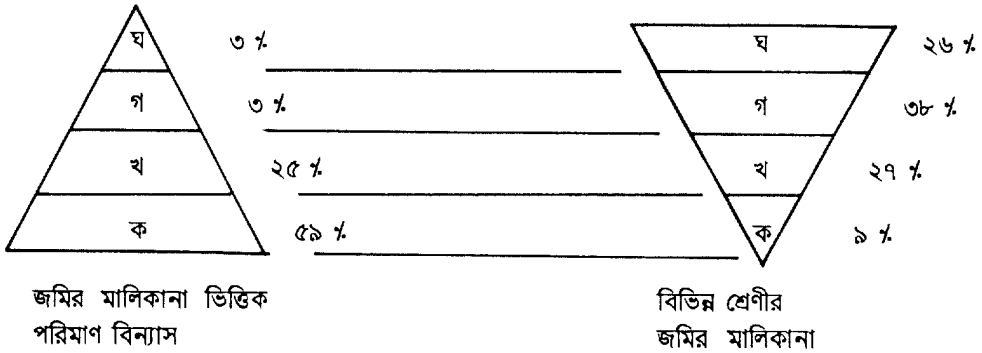

জমির মালিকানা ভিত্তিক পরিমাণ বিন্যাস

বিভিন্ন শ্রেণীর জমির মালিকানা

* ডাঃ কে, এস, হুদা, পরিচালক, এডাব, ঢাকা, বাংলাদেশ এবং মোঃ শহীদ হোসেন তালুকদার, প্রশিক্ষণ উপদেষ্টা, কানাডীয়ান রিসোর্স টীম/সিডা, ঢাকা

ক. ভূমিহীন– যাদের কোন জমি নাই অথবা ভিটাসহ জমির পরিমাণ ১.০০ একর
খ. ক্ষুদ্র কৃষক– যাদের জমির পরিমাণ ১.০১–৩.০০ একর
গ. মাঝারী কৃষক– যাদের জমির পরিমাণ ৩.০১–৮.০০ একর
ঘ. বড় কৃষক– যাদের জমির পরিমাণ ৮.০০ একর

প্রোগ্রামসমূহের সুবিধা ভোগের মূল্যায়ন

নির্দেশ

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক এবং জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রমের বিভিন্ন সহায়তা/সেবা ও অর্থনৈতিক সুবিধাভোগের কথা চিন্তা করুন। আপনার হিসাব সম্পূর্ণ ঠিক নাও হতে পারে। আপনার ধারণা বাস্তবের কাছাকাছি রাখতে চেষ্টা করুন।

এ অনুশীলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন্ শ্রেণীর জনগণ জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলাফল কত ভাগ ভোগ করেন তা যাচাই করা।

প্রোগ্রাম	শতকরা–সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন				
শ্রেণী	উচ্চ শ্রেণী	মধ্যবিত্ত	উচ্চ মধ্যবিত্ত	নিম্ন মধ্যবিত্ত	বিত্তহীন দরিদ্র
কৃষি (ঋণ, সার, সেচ এবং বাজারজাতকরণ)					
শিক্ষা (প্রাথমিক, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়)					
স্বাস্থ্য					
শিল্প/(ঋণ)					
বিদ্যুতায়ন					
মৎস্য উন্নয়ন (ঋণ, সম্প্রসারণ, উপকরণ ইত্যাদি)					